বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ

ডেথ রেফারেন্স নং ২৬/২০১৫
ফৌজদারী আপীল নং ১৬৯৫/২০১৫
জেল আপিল নং ৪৬/২০১৫

রাষ্ট্র এবং অন্য একজন
-বনাম-
মোঃ আব্দুস সালাম এবং অন্য একজন

মিসেস কাজী শাহানারা ইয়াসমিন, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, জনাব জাহিদ আহমেদ (হিরো) এবং মিস সাবিনা পারভিন, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল।

.....রাষ্ট্রপক্ষ
(আপিলে এবং রেফারেন্স উভয়ের রেসপন্ডেন্ট)

অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক,
অ্যাডভোকেট সাকিব মাহবুদ
..... দন্ডিত-বন্দীর পক্ষে-
আপীলকারী
(ফৌজদারী আপীল নং ১৬৯৫/২০১৫,
জেল আপিল নং ৪৬/২০১৫)

রায় প্রকাশঃ ২৫.০১.২০২১

সম্মানিত বিচারকগনঃ
মাননীয় বিচারপতি এস এম এমদাদুল হক
এবং
মাননীয় বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী

রায়

বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী

১. নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, সিরাজগঞ্জ এর বিজ্ঞ বিচারক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং ১০/২০০৯ এ মোঃ আব্দুস সালাম, পিতাঃ মোঃ শুকুর আলী ওরফে শুক্রা- কে দোষী সাব্যস্থ করে বিগত ২৩/০১/২০১৫ তারিখে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে প্রদত্ত রায়ের অনুমোদনের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৪ ধারায় অত্র রেফারেন্স দিয়েছেন।

২.উল্লিখিত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে দন্ডিত-কয়েদি জেল আপিল এবং পরবর্তীতে নিয়মিত ফৌজদারি আপিল দায়ের করেন। যেহেতু একই রায় ও আদেশের মাধ্যমে রেফারেন্স এবং আপিলের উদ্ভব হয়েছে, তাই উভয়ের একইসাথে শুনানি এবং নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

৩. ভিকটিম/নিহত ফাতেমা খাতুনের মামা, প্রসিকিউশনের প্রথম সাক্ষী মোঃ গোলবার হোসেন এজাহার এ বলেন ভিকটিমের সাথে অভিযুক্ত আব্দুস সালামের ১০ বছর আগে বিবাহ হয়েছিলো। বিবাহ বলবৎকালীন সময়ে তার দুটো পুত্র সন্তান হয়েছিলো। বিবাহের পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী, তার বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয়রা ভিকটিমের কাছে যৌতুক দাবি করতে থাকে। দুই দফায় তাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করে এবং ভিকটিমের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।। উপরোল্লেখিত দাবি পূরণের জন্য তারা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতো। বিষয়টি মিমাংসার জন্য সালিশ হয় এবং একই কারণে ভুক্তভোগী সংশ্লিষ্ট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। ভিকটিম যৌতুক দিতে অস্বীকৃতি জানালে ২৬.০৭.২০০৮ তারিখ রাতে সকল আসামীরা ১নং আসামীর বাড়িতে ভিক্টিমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এরপর তারা নিহতের লাশ ঘর থেকে বাহিরে বের করে একটি খেজুর গাছের সঙ্গে বেঁধে ভিক্টিমের শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভিকটি্মের, চোখ, কান ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ আগুনে ঝলসে কালো হয়ে যায়। সকাল ৬টার দিকে তার ভাতিজা জিয়াউর রহমান (পিডব্লিউ ৩) এর কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সেখানে তিনি জমায়েত দেখতে পান। ঘরের ভিতরে তিনি খুনের আলামত খুঁজে পান এবং খেজুর গাছের সঙ্গে বাঁধা অগ্নিদগ্ধ লাশ প্রত্যক্ষ করেন। ইতোমধ্যে ভিক্টিমের দুই নাবালক সন্তানকে সাথে নিয়ে অভিযুক্তরা সবাই পালিয়ে যায়।

৪. উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১(ক) এবং ৩০ ধারায় দন্ডপ্রাপ্ত আসামী এবং আরো ৮ জনের বিরুদ্ধে উল্লাপাড়া থানার মামলা নং ২১ (তারিখ ২৭.০৭.২০০৮), জিআর নং ২১০/২০০৮ শুরু হয়।

৫.উল্লাপড়া থানার কর্মরত উপ পরিদর্শক (এসআই) মোঃ সাদেকুর রহমান (পিডব্লিউ ১১) মামলাটি তদন্ত করেন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন। তিনি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহন করেন, অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেন এবং দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গ্রহণ করার জন্য তাকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করেন। তদন্তের পরে তিনি শুধুমাত্র অভিযুক্ত স্বামীর (দন্ডপ্রাপ্ত আসামী) বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পান এবং উল্লেখিত আইনের ১১(ক) ধারায় তার বিরুদ্ধে চার্জশীট জমা দেন। তবে চার্জশিটে এফআইআর-এ উল্লেখিত অন্য আট অভিযুক্তকে তিনি অন্তর্ভূক্ত করেননি।

৬.অবশেষে মামলাটির নথি নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, সিরাজগঞ্জ-এ বিচারের জন্য আসে। সংবাদদাতা পুলিশ রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজী পিটিশন দায়ের করেন । শুনানির পর ট্রাইব্যুনাল

নারাজী প্রত্যাখ্যান করে চার্জশিট গ্রহণ করেন এবং আইনের ধারা ১১(ক) এর অধীনে একমাত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। আসামীর বিরূদ্ধে গঠিত অভিযোগটি তাকে পড়ে শোনানো হয়, এতে তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রার্থনা করে বিচারের দাবি করেন।

৭. বিচারের সময় প্রসিকিউশন চার্জশিটে উল্লেখিত ১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ১২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন; তাদের মধ্যে পিডব্লিউ-১ সংবাদদাতা মোঃ গোলবার হোসেন সাক্ষে বলেন যে ঘটনাটি ২৬/০৭/২০০৮ তারিখ রাতে ঘটে। পরদিন সকালে তার ভাতিজা জিয়াউর রহমান টেলিফোনে তাকে ভিক্টিমের মৃত্যুর খবর জানান। তিনি সেখানে গিয়ে অভিযুক্তের বাড়ির পাশে একটি খেজুর গাছের নিচে ভিক্টিমের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর তিনি সেই সংবাদ থানায় পৌঁছে দেন। পুলিশ অভিযুক্তদের বাড়িতে গেলেও সেখানে তাদের পাওয়া যায়নি। তার উপস্থিতিত পুলিশ সুরতহাল করেন। তিনি এজাহার এবং সুরতহাল প্রতিবেদন যথাক্রমে- প্রদর্শনী- ১ ও ২ প্রমাণ করেন এবং তাতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। তিনি প্রদর্শনী-৩ এর মাধ্যমে জব্দকৃত আলামত প্রমাণ করেন। ভিক্টিমের মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তা তিনি বলতে পারেননি। যখন তিনি বললেন যে ভিকটিমকে ২৬/০৭/২০০৮ তারিখে রাতে যৌতুকের জন্য গলা কেটে হত্যা করা হয়েছিল কিনা তিনি জানেন না তখন প্রসিকিউশন কর্তৃক তাকে বৈরী ঘোষণা করা হয় এবং প্রসিকিউশন তাকে জেরা করেন। অভিযুক্তরা ভিকটিমকে খেজুর গাছের সঙ্গে বেঁধেছে নাকি তার গায়ে কেরোসিন তেল/ডিজেল ঢেলে আগুন দিয়েছে তা তিনি বলতে পারেন নি। পুড়ে ঝলসে যাওয়ায় নিহতের শরীর কালচে হয়ে গেছে। তিনি প্রসিকিউশনের সাজেশন অস্বীকার করেন যে তারা অভিযুক্তের সাথে একটি আপস করেছে এবং তাকে বাঁচাতে তিনি মিথ্যা জবানবন্দি দিয়েছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জেরায় তিনি বলেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এজহার লিখেছেন কিন্তু তা তাকে পড়ে শোনানো হয়নি৷ তদন্ত প্রতিবেদন এবং জব্দ তালিকাও তাকে পড়ে শোনানো হয়নি। অভিযুক্ত ও ভিকটিমের মধ্যে কোনো তিক্ত সম্পর্কের কথা তিনি শোনেননি। তিনি শোনেননি যে নির্যাতিতা পেটের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছে। নিহত ব্যক্তির শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন তিনি দেখেননি। ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক তখন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তিনি কেন মামলা করেছেন জানতে চাইলে তিনি তার কোনো জবাব দেননি। পরবর্তীতে তিনি জানান যে, তিনি আসামীকে বাড়িতে দেখেননি এবং এ কারণে তিনি তাকে সন্দেহ করে মামলার আসামী করেন। আসামীপক্ষের জেরা তিনি বলেছিলেন যে ঘটনার দিন তিনি অভিযুক্তকে তার বাড়িতে দেখেননি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই।

৮.ভিকটিমের মা লাইলী (পিডব্লিউ-২) জানান, ১১ শ্রাবণ ১৪১৫ রাতে এ ঘটনা ঘটে। তিনি চৌকিদার আবদুস সাত্তার (পিডব্লিউ ৫) এর মাধ্যমে খবর পেয়ে অভিযুক্তের বাড়িতে যান। কিন্তু তাকে তার মেয়ের লাশ দেখতে দেয়া হয়নি।যখন তিনি বলেন যে অভিযুক্তরা যৌতুকের জন্য তার মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করেছে, নাকি তারপর একটি খেজুর গাছের সাথে মৃতদেহ বেঁধে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়েছে তা তিনি জানেন না তখন তাকে বৈরী ঘোষণা করা হয় এবং প্রসিকিউশন তাকে জেরা করেন। ঘটনার সময় তিনি ঢাকায় ছিলেন। তিনি অভিযুক্তকে বাঁচাতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন , প্রসিকিউশনের এমন সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। আসামীপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন যে তিনি ভিকটিমের সাথে অভিযুক্তের কোনও ঝগড়ার কথা কখনো শোনেননি। নির্যাতিতা এর আগেও পেটের ব্যথায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন । সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা জানান ভিকটিম নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

৯.জিয়াউর রহমান (পিডব্লিউ-৩) , মোসাঃ আন্না খাতুন (পিডব্লিউ-৬),জয়নব (পিডব্লিউ-৭) এবং মোসাঃ হাজরা খাতুন (পিডব্লিউ-৮) কে প্রসিকিউশন টেন্ডার করলে এবং প্রতিপক্ষ তাদের জেরা করতে অস্বীকার করে।

১০. ভিকটিমের ভাই মোঃ নুর ইসলাম (পিডব্লিউ-৪) জানান, প্রায় ৬ (ছয়) বছর আগে এক রাতে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ঢাকায় অবস্থানকালে টেলিফোনে দুঃসংবাদটি পান। ঘটনাস্থল অভিযুক্তের

বাড়িতে পৌঁছে তিনি তার বোনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। পুলিশ এসে সুরতহাল করে। তিনি প্রতিবেদন প্রদর্শনী-১ এ প্রমাণ করেন এবং তাতে নিজ স্বাক্ষর-১/২ চিহ্নিত করেন। অভিযুক্তরা তার বোনের কাছে যৌতুক দাবি করে এবং ২৬/০৭/২০০৮ তারিখে রাতে তাকে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে হত্যা করে তাকে পুড়িয়ে মারে সেকথা তিনি অস্বীকার করলে তাকে প্রসিকিউশন বৈরী ঘোষণা করে জেরা করে । অভিযুক্তকে বাঁচাতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রসিকিউশনের সাজেশনও তিনি অস্বীকার করেন। আসামীপক্ষের জেরাতে তিনি বলেছিলেন যে তার বোন দীর্ঘদিন ধরে পেটে ব্যথায় ভুগছিলেন এবং এর জন্য তিনি বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন। ঘটনার দিন তার বোন আত্মহত্যা করেছে বলে সে শুনেছে। অভিযুক্ত ওই দিন বাড়িতে ছিলেন না।

১১. পিডব্লিউ-৫ দফাদার মোঃ আব্দুস সাত্তার (পিডব্লিউ-৫) জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল ৫/৬ বছর আগে। ভিকটিম ফাতেমা পেটের ব্যথায় ভুগছিলেন। তিনি শুনেছেন যে সে আত্মহত্যা করেছে। অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে তিনি গাছের নিচে লাশ পড়ে থাকতে দেখেন । পুলিশ এসে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং তাতে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। তিনি সুরতহাল প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/২ হিসাবে প্রমাণ করেন। তিনিও জব্দের সাক্ষী ছিলেন। তিনি জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৪ এর মাধ্যমে প্রমাণ করেন এবং তাতে নিজ স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। আসামীপক্ষের জেরাতে তিনি বলেছিলেন যে অভিযুক্ত ঘটনার দিন বাড়িতে ছিল না। জব্দ তালিকা তাকে পড়ে শোনানো হয়নি।

১২. প্রতিবেশী মোঃ খবির উদ্দিন (পিডব্লিউ-৯) জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল ৫/৬ বছর আগে। তিনি শুনেছেন, ভিকটিম পেটের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বলেছিলেন যে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে পরীক্ষা করেনি।

১৩. সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার শরিফুল হক সিদ্দিকী (পিডব্লিউ-১০) জানান তিনি ভিকটিমের ময়নাতদন্তের জন্য গঠিত বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ময়নাতদন্তে তারা নিম্নলিখিত আঘাতগুলি খুঁজে পেয়েছে:

১. ঘাড়ে ক্ষীণ দাগ।
২. মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো শরীর জুড়ে ব্যাপক পোড়া ক্ষত।

১৪. তারা পোস্টমর্টেম রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করেন যে শ্বাসরোধের ফলে শ্বাসকষ্টজনিতকারনে ভিকটিমের মৃত্যু হয় এবং পরবর্তীতে লাশ পোড়ানো হয় যা ছিলো নরহত্যা প্রকৃতির। । তিনি ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী -৫ এ প্রমাণ করেন এবং তাতে নিজ স্বাক্ষর-৫/১ শনাক্ত করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মৃতদেহ শক্ত পেয়েছেন এবং ভিকটিমের পাকস্থলী খালি ছিলো। তিনি মৃতদেহে প্রাপ্ত আঘাত কখন করা হয়েছে তা বলতে ব্যর্থ হন। ভিকটিমের থুতনী বা গলয় কোনো আঁচড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ভিকটিম আত্মহত্যা করেছেন বলে আসামীপক্ষের সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কোন বৈজ্ঞানিক মতামত না থাকার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন। তিনি আরও অস্বীকার করেছেন স্বার্থান্বেষী মহলের অনুরোধে তিনি একটি মিথ্যা প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন।

১৫. পুলিশের উপ-পরিদর্শক এবং তদন্তকারি কর্মকর্তা মোঃ সাদেকুর রহমান (পিডব্লিউ-১১) জবানবন্দীতে বলেন , যে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, স্কেচ ম্যাপ প্রস্তুত করেছেন যথাক্রমে ইনডেক্স প্রদর্শনী ৬ এবং ৭। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠান। তিনি দুটি জব্দ প্রদর্শনী-৩ ও ৪ সহ আলামত জব্দ করেন। তিনি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তার দোষ স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি প্রসিকিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং শুধুমাত্র অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের ১১(ক) ধারায় চার্জশিট জমা দেন। তিনি আলামতের পনেরোটি আইটেমকে বস্তুগত প্রদর্শনী - I-XV

হিসেবে চিহ্নিত করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, একটি খেজুর গাছের নিচে লাশ পাওয়া গেছে। এটি অভিযুক্তের বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ হাত দূরে ছিল। ঘটনাস্থল বাড়ির আশেপাশে আরো নয়টি বাড়ি ছিল। তিনি প্রতিরক্ষা সাজেশন অস্বীকার করেছেন যে তারা তৃতীয় মাত্রা পদ্ধতি প্রয়োগ করে দোষ স্বীকারোক্তি আদায় করেছে। তিনি অস্বীকার করেছেন যে এটি স্বেচ্ছায় হয়নি। ঘটনার দিন অভিযুক্ত বাড়ীতে ছিল না বা অভিযুক্ত কোনো অপরাধ করেনি বলে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি অস্বীকার করেছেন যে তিনি সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ড করেননি, বা ঘটনাস্থলে যাননি। তিনি আলামতগুলো সঠিকভাবে জব্দ না করা এবং একটি অবাস্তব প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন ।

১৬.তাঁর সাক্ষে একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নুরে আলম (পিডব্লিউ-১২),বলেছেন যে তিনি ০১/০৯/২০০৮ তারিখে আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী রেকর্ড করেছেন। তিনি দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অভিযুক্তকে তার অফিসের পিয়নের হেফাজতে রাখেন এবং তারপরে আইনের বিধানানুসারে দোষ স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন। স্বীকারোক্তিতে তিনি আসামির স্বাক্ষর নেন। স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তির গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অভিযুক্ত তাকে জানান , তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। স্বীকারোক্তির প্রতিটি পাতায় তিনি স্বাক্ষর করেছেন। তিনি স্বীকারোক্তি প্রদর্শনী-৮ প্রমাণ করেছেন এবং তাতে নিজ স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন (৮/১ সিরিজ)। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বলেছেন যে স্বীকারোক্তির প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে অভিযুক্তকে ৩১.০৮.২০০৮ তারিখে তার সামনে হাজির করা হয়েছিল। এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তিনি আরও লিখেছেন যে অভিযুক্তকে ৩০.০৮.২০০৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা ২৫ মিনিটে পূর্নিমাগাতী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ০১/০৯/২০০৮ তারিখ দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে অভিযুক্তকে আবারও তার কাছে আনা হয়। স্বীকারোক্তিতে তিনি লেখেননি যে অভিযুক্তকে তার সামনে দুবার হাজির করা হয়েছিলো। তিনি আসামীপক্ষের আইনজীবীর সাজেশন অস্বীকার করেন যে কলাম ৩ এর নীচে তিনি লিখেননি যে অভিযুক্তকে দুপুর ১২.৪৫ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত তার পিয়নের হেফাজতে রাখা হয়েছিল। তিনি ৫ নং কলামটি পূরণ করেননি, তবে তিনি ৩য় পৃষ্ঠায় ৬ নং কলামে উত্তরগুলি লিখেছিলেন। তিনি আসামীপক্ষের আইনজীবীর সাজেশন অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি কলাম নং ৫ এ নির্ধারিত অভিযুক্তকে প্রশ্ন করেননি। স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করেননি। তিনি আসামীপক্ষের আইনজীবীর সাজেশন অস্বীকার করেন যে অভিযুক্তের শরীরে হামলার চিহ্ন ছিলো এবং তিনি তা তাকে দেখিয়েছিলেন। স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে আইনের আনুষ্ঠানিকতা না মানার আসামীপক্ষের আইনজীবীর সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি ০১.০৯.২০০৮ তারিখে বিকাল ৫.১০ ঘটিকার দিকে আসামীকে কারাগারে প্রেরণ করেন। তিনি ,পুলিশের সাজেশন অনুসারে সাতটি অতিরিক্ত শীটে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার অস্বীকার করেন।

১৭. প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে, ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে পরীক্ষা করেন। আসামী তার নির্দোষতা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ন্যায়বিচার দাবি করেন কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো সাক্ষীকে পরীক্ষা করেননি। তবে উপরোক্ত পরীক্ষার জবাবে তিনি ট্রাইব্যুনালে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন যে ভিকটিম তার পেটের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে অমানবিক নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে নির্যাতন করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দিতে বাধ্য করেছিলেন অন্যথায় তাকে ক্রসফায়ার দেয়া হবে। ফলে তিনি সে অনুযায়ী বিবৃতি দিয়েছেন।

১৮.আসামীপক্ষের ডিফেন্স কেইস মূলত প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের জেরা করার মাধ্যমে এবং কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় অভিযুক্তের প্রদত্ত বিবৃতির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে ভিকটিম তার অসহ্য পেটে ব্যথার কারণে তার নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং তৃতীয় মাত্রা পদ্ধতি প্রয়োগ করে আসামীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে।

১৯. ট্রাইব্যুনাল রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য ও অন্যান্য উপকরণ বিবেচনা করে, আইনের ধারা ১১(ক) এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে মৃত্যুদন্ড ও বিশ হাজার টাকা জরিমানা প্রদানের আদেশ প্রদান করেন। এর মাধ্যমেই এই রেফারেন্স ও আপীলের উদ্ভব হয়।

২০.বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মিসেস কাজী শাহানারা ইয়াসমিন নথিপত্রের সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে এটি একটি স্ত্রী হত্যা (Wife Killing) মামলা। দন্ডিত ব্যক্তি পূর্বপরিকল্পিতভাবে নিজের স্ত্রীকে নিজ হেফাজতে থাকা অবস্থায় নৃশংসভাবে হত্যা করে। সে তাকে নিজ বাড়িতে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং লাশটি বাইরে নিয়ে যায়। অতঃপর খেজুর গাছের সঙ্গে বেঁধে তাতে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারা অনুসারে স্বামী – স্ত্রী একই ছাদের নিচে বসবাসরত অবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে সেই মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করা স্বামীর উপরে বর্তায়। কিন্তু দণ্ডিত আসামী দুর্ভাগ্যক্রমে তা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন। যদিও প্রসিকিউশনের অধিকাংশ সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছে তবুও সাক্ষীদের জেরার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে দণ্ডিত বন্দী ভিকটিমের নিকট যৌতুক দাবি করে এবং উক্ত যৌতুক পরিশোধ না করায় তাকে হত্যা করা হয়। আসামীপক্ষের ডিফেন্সে কেস ভিকটিম দীর্ঘস্থায়ী পেটে ব্যথার জন্য আত্মহত্যা করেছে বলে দাবী করলেও মেডিকেল প্রমাণ দ্বারা উহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। প্রসিকিউশন সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে দণ্ডিত-বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং দন্ডাদেশ আইনগত সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রদত্ত এবং তা বহাল রাখা উচিত।

২১. অপরদিকে আপীলকারীর আইনজীবী জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক যুক্তি উপস্থাপন করেন যে কিছু ঘটনা প্রমাণ করার ভার শুধুমাত্র প্রসিকিউশনের উপর বর্তায়। আপিলকারীর বিরুদ্ধে আইনের ১১(ক) ধারায় আনিত অভিযোগ প্রমাণ করতে প্রসিকিউশন ব্যর্থ হয়েছে। উল্লিখিত ধারার অধীনে একজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, প্রসিকিউশনকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যৌতুক দাবি করেছিলো এবং তা পরিশোধ না করার কারণে ভিকটিমকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী পিডব্লিউস-১,২ এবং ৪ কে প্রসিকিউশন দ্বারা বৈরী ঘোষণা করা হয়েছিল এবং পিডব্লিউস-৩-৭ এবং ৮ কে টেন্ডার করা হয়েছিল। প্রসিকিউশন পিডব্লিউস-১,২ এবং ৪-কে জেরা করলেও দন্ডিত ব্যক্তির দ্বারা যৌতুকের দাবি করা এবং যৌতুক না দেয়ার ফলে ভিকটিমকে হত্যা করার বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের জেরার মাধ্যমে ডিফেন্স কেসে প্রতীয়মান হয়েছে যে ভিকটিম অসহ্য পেটে ব্যথার কারণে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে যা মেডিকেল সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।

২২.মিঃ হক তার যুক্তি উত্থাপন কনে যে, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর। প্রসিকিউশনের দাবি অনুযায়ী ভিকটিমকে খুন করা হয়েছে এর দ্বারা এটা প্রমাণ হয়না।। যেখানে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোন সন্দেহ রয়েছে সেখানে আসামী এর সুবিধা পাবেন। মিঃ হক বলেন কোডের ৩৪২ ধারায় অভিযুক্তকে পরীক্ষার সময়ে অভিযুক্তের লিখিত উত্তরের মাধ্যমে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ভিকটিম আত্মহত্যা করেছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যে স্বীকারোক্তি দিয়েছে তা স্বেচ্ছায় ছিল না। এটি জোরপূর্বক এবং জবরদস্তির মাধ্যমে আদায় করা হয়েছিল। সুতরাং এই স্বীকারোক্তি অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যবহার করা যাবে না।

২৩.   মিঃ হক আরও যুক্তি প্রদান করেন যে, যদি স্বীকারোক্তিটি সত্য স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবুও এটি প্রকাশ করে না যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভিকটিমকে হত্যা করেছে। আপীলকারী তার স্ত্রীর গুরুতর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে তার গলায় চাপ দেয় এবং ফলস্বরূপ ভিকটিম মারা যায়।

স্বীকারোক্তিতে যে অপরাধ প্রকাশিত হয়েছে তা আইনের ১১ (ক) ধারায় যৌতুকের জন্য হত্যার মধ্যে পড়ে না। ট্রাইব্যুনাল তার বিচারিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়নি এবং সাক্ষ্য প্রমাণের প্রকৃত মূল্যায়ন না করেই রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করেন। সুতরাং এই রায় ও দন্ডাদেশ বাতিল হওয়া উচিত এবং দন্ডিত আসামীকে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া উচিৎ।

২৪.বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল উপরোক্ত যুক্তির জবাবে বলেন যে দণ্ডিত-কয়েদির দ্বারা সংঘটিত অপরাধ দণ্ডবিধির ১০০ ধারার অর্থের মধ্যে আসে না। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, আসামি প্রথমে ভিকটিমকে আক্রমণ করে। তিনি ভিকটিমকে ঘাড় ধরে টেনে নেন এবং তারপর ভিকটিম নিজেকে বাঁচাতে আসামীকে আক্রমণ করে। তিনি আরো বলেন যে করেন যে আসামী তার স্বীকারোক্তিতে ভিকটিমের কাছে যৌতুকের দাবির বিষয়টি অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে চাপা দিয়েছিলো। নিজেকে জঘন্য অপরাধ থেকে বাঁচাতে আত্মরক্ষার ডিফেন্স নিয়ে ঘটনার কথা স্বীকার করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। যেহেতু প্রসিকিউশন দণ্ডিত স্বামীর বিরুদ্ধে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণ করেছে এবং অপরাধটি জঘন্য ও নৃশংস, তাই বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড ন্যায্য এবং তা বহাল রাখা উচিত।

২৫. আমরা বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং আপিলকারী পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের যুক্তিসমূহ বিবেচনা করেছি এবং রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য প্রমাণ দেখেছি।

২৬. প্রসিকিউশন ১২ (বার) জন সাক্ষীকে পরীক্ষার জন্য হাজির করেছিল; তাদের মধ্যে পিডব্লিউ-১হল ভিকটিমের মামা, পিডব্লিউ-২ তার মা এবং পিডব্লিউ-৪ ভাই। পিডব্লিউ-৩ এবং ৫-৯ হল অভিযুক্তের প্রতিবেশীরা। পিডব্লিউ-১০ একজন ডাক্তার যিনি মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করেছেন, পিডব্লিউ-১১ হলেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং পিডব্লিউ-১২ হলেন ম্যাজিস্ট্রেট যিনি অভিযুক্তের দোষ স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেছেন এবং তারা আনুষ্ঠানিক সাক্ষী। পরীক্ষিত সাক্ষীদের মধ্যে পিডব্লিউস-১,২ এবং ৪ কে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছিল এবং প্রসিকিউশন এবং আসামীপক্ষ উভয়পক্ষই তাদের জেরা করেছেন। পিডব্লিউ-৩,৬,৭ এবং ৮ কে টেন্ডার করা হয়েছিল এবং আসামীপক্ষ তাদের জেরা করতে অস্বীকার করেছিল।

২৭.এটা স্বীকার্য যে ঘটনার কোন প্রত্যক্ষদর্শী নেই তবে ভিকটিমের মৃতদেহ দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ হাত দূরে পাওয়া গেছে। ভিকটিমের গলায় ও ঘাড়ে কালচে দাগ এবং তার শরীরের বেশিরভাগ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ছিল। পিডব্লিউ-১,২ এবং ৪, বৈরী সাক্ষীদের বক্তব্য মূল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাই যে যদিও তারা নিহত ভিকটিমের আত্মীয় ছিল কিন্তু কোন না কোনভাবে তারা আসামীপক্ষের দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে। সম্ভবত তারা ভিকটিমের দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছিলেন এবং সেই হিসাবে অভিযুক্তকে বাঁচাতে তার পক্ষপাতী হয়েছেন। জেরায় প্রসিকিউশন সাক্ষীদের সাজেশন দেয় যে অভিযুক্ত যৌতুক না দেওয়ার জন্য ভিকটিমকে হত্যা করেছে কিন্তু তারা উত্তর দেয় যে তারা এটি জানে না। ট্রাইব্যুনাল উপরোক্ত উত্তরটিকে যৌতুকের জন্য ভিকটিমকে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছে বলে বিবেচনা করে এবং আইনের ১১(ক) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। ট্রাইব্যুনাল এমন সিদ্ধান্তে মৌখিক সাক্ষ্য মূল্যায়নে ঘটনাগত ও আইনগত ভুল করেছে। এখানে বৈরী সাক্ষীরা (পিডব্লিউস-১,২ এবং ৪) সাজেশনে উত্তর দিয়েছে যে ঘটনা তারা জানত না । এর মানে এই নয় যে যৌতুকের জন্য হত্যার বিষয়টি সাক্ষীরা স্বীকার করেছে। সাক্ষীদের জেরা ও জবানবন্দী যাচাই ও মূল্যায়ন করে আমরা দেখতে পাই যে যৌতুক দাবি করা এবং যৌতুকের অর্থ প্রদান না করার জন্য হত্যার অভিযোগ প্রমাণে প্রসিকিউশন ব্যর্থ হয়েছে।

২৮. প্রসিকিউশনের কিছু সাক্ষীকে সাজেশন দেওয়া হয়েছে যে পেটে ব্যথার কারণে ভিকটিম নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে যা সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সুরতহালে (প্রদর্শনী-১) তদন্তকারী কর্মকর্তা ভিকটিমের 'জিহ্বা বের করে দাঁতে কামড়ানো অবস্থায়' এবং গলায় 'কালচে দাগ' দেখতে পান যা সুরতহালে উল্লেখ রয়েছে। ময়নাতদন্তেও (প্রদর্শনী-৫) ডাক্তার (পিডব্লিউ-১০) 'জিহ্বা দাঁত দিয়ে কামড়ানো অবস্থায় পেয়েছেন। তিনি 'ঘাড়ের চারপাশে অস্পষ্ট ক্ষত' এবং 'মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পুরো শরীরে ব্যাপকভাবে পোড়া ক্ষত' পান। ময়না তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে শ্বাসরোধের ফলে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে ভিকটিমের মৃত্যু হয়েছে এবং তারপর লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে যা ছিল নরহত্যা প্রকৃতির। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এবং ডাক্তার (পিডব্লিউ-১০) এর সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে প্রথমে ভিকটিমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল এবং তারপরে তার শরীরে আগুন দেওয়া হয়েছিল। দন্ডিত-কয়েদীর স্বীকারোক্তি উপরোক্ত ঘটনাটি পুরোপুরি সমর্থন করে

২৯. এই মামলায় দন্ডিত-কয়েদির বিরুদ্ধে কোনো চাক্ষুস সাক্ষী নেই। সেই ভয়াল রাতে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বাড়িতে ছিলেন এমন কোনো প্রমাণও নেই। নথিপত্র থেকে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয় যে ঘটনার পরে আসামী পালিয়ে গিয়েছেন। তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে তার দোষ স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী-৮) ব্যতীত বাসায় অবস্থান করার আর কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। আলোচনার সুবিধার্থে আসামীর দোষ স্বীকারোক্তি নিচে দেয়া হলো -

> "আমি নাটোর বনপাড়ায় প্লাস্টিকের ব্যবসা করি। ১৯ দিন পর শনিবার বিকাল ৫.০০ টার সময় আমি বাড়ী আসি। তখন বাড়ীতে এসে মা, আমার স্ত্রী, তিন ভাবীকে পাই। মাকে জিজ্ঞাসা করি পান-সুপারী লাগবে কিনা। আমার স্ত্রী সাবিনাকে বলি কি কি লাগবে? সাবিনা বললো সব বাজারই লাগবে। বাজার করে বেলা ডুবার পর (সন্ধ্যার পর) বাড়ী আসি। রান্না করতে বলে আমি পাগলা বাজার মোবাইল করতে যাই। বলে যাই ভাইদের বলে আসি নাই, তাই মোবাইল করে আসি। আমি পাগলা বাজার শাহীন ডাক্তারের দোকানে যাই। এই দোকান থেকে ফোন করি জেল হক (পাইকার) এর কাছে। তার বাড়ী চর সাতবাড়ীয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। সে বলে সে রাজশাহীতে আছে। আমি জেল হকের নিকট ৭.৩০ টার পরে ফোন করি। সে বলে বনবাড়ী এসে মিসকল দিবে তখন যেন আমি ফোন দেই। আমি শাহীন ডাক্তারের দোকানে বসে থাকি। শাহীন ডাক্তার ছিল। আমি ঘণ্টা খানেক বসে থাকি। অনুমান ঘণ্টাখানিক পর জেল হক মিস কল দিলে আমি কল করি। তখন তিন ভাই এর সঙ্গে কথা বলি। আমি বলি তোরা চিন্তা করিসনা। আমি বাড়ী এসেছি। প্রথমে ০২ টাকা বিল দেই। পরে ০৮ টাকা বিল দেই। জেল হকের নম্বর মনে নাই। কার্ডে নম্বর ছিল। ৮.৩০ টার পর আমি আমি বাড়ী চলে আসি। এসে দেখি সব ঘরে বাতি নেভানো। আমি ডাক দিলে সাবিনা বলে দরজা খোলা আছে। আমি অন্য কাউকে ডাকি নাই। ঘরে ঢুকলাম। আমার নিকট ম্যাচ লাইট ছিল তা দিয়ে বাতি ধরাই। বউ চকির উপর শুয়ে ছিল। আমি ভাত চাই। বউ বলল যার যার ভাত সেই সে পাক করে খাউক। আমি ঘাড় ধরে নীচে নামাই। বলি ভাত পাক করে আমাকে ভাত দিবি। তার আগে আমি শুবনা। আমি চকির পাশে দাড়ানো। অমনি আমার নুনু (পুরুষাংগ সহ অন্ডকোষ) ধরে চাপ দেয়। আমি বলি ছেড়ে দে মান-সম্মানের ব্যাপার আছে। জানাজানি হলে মান ইজ্জত যাবে। যখন ছাড়ে না তখন আমি আমার দুইহাত দিয়ে সাবিনার গলা চাইপা ধরি। আমার বউ সাবিনা (তার নাম ফাতেমা খাতুন কিন্তু আমার কাকীর নাম ফাতেমা থাকায় বিয়ের সময় বউ এর নাম পাল্টিয়ে সাবিনা খাতুন করা হয়। সাবিনা নামেই কাবিন করা হয় এবং পরবর্তীতে সবাই সাবিনা নামেই ডাকে) কোচ/নুনু অন্ডকোষসহ না ছাড়লে আমি তার গলা আরো জোরে চেপে ধরি। আমাকেও জোরে চেপে ধরে। আমিও জোরে চেপে ধরি। কিছুক্ষণ পর আস্তে করে সে কোচ ছেড়ে দেয়। আমিও তার গলা ছেড়ে দেই। আমি দেখি সে নীচে পরে গেছে। আমি ডাকলে কোন জবাব দেয় না। আমি চকির উপরে বসলাম। বাড়ীর কাউকে ডাকি নাই। বউ এর শরীরে পানি ঢালিনাই বা কিছু করি নাই। ঘণ্টা দুয়েক চকির উপর বসে থাকি। অনুমান ১২.০০ টার পূর্বে ঠেলে তুলে দেখি বউ সাবিনা মরে গেছে। আমি পাজা কোলা করে আমার ঘর হতে বের করে (পশ্চিমে) অন্যান্য ঘরের পিছন দিয়ে গিয়ে নুর ইসলাম বাড়ীর কানি দিয়ে যাই। নুর ইসলামের বাড়ীর পূর্ব দিকে টিউবয়েলের পাশে আম গাছের পাশে নিয়ে মাটিতে লাশ রাখি। তারপর পুনরায় ঘরে এসে ক্যারোসিন তেলের ডোব নিয়ে যাই (পৌনে দুই লিটার তেল ছিল)। তেল নিয়ে সারা শরীরে ঢালি। তখন আকাশে তারা ছিল। ম্যাচ লাইট দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেই। আমি ৮-১০ হাত দূরে এসে দাড়াই। এক মিনিট পর আমি বাড়ী ফিরে আসি। ঘরে বসে থাকি।

৩০. আমাদের সর্বোচ্চ আদালত অসংখ্য মামলায় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে স্বীকারোক্তি যদি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি স্বীকারোক্তিকারীকে দন্ড প্রদানের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি সত্য এবং স্বেচ্ছায় করা হয়েছে কিনা। আমরা দেখতে পাই যে পুলিশ ৩০.০৮.২০০৮ তারিখে সন্ধ্যা ৬ টা ১৫ মিনিটের দিকে আসামীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। ৩১.০৮.২০০৮ তারিখ বিকালে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার জন্য হাজির করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সেদিন স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার মতো পর্যাপ্ত সময় ছিল না এবং ফলস্বরূপ তিনি আসামীকে হাজতে প্রেরণ করেন। পরের দিন অর্থাৎ ০১.০৯.২০০৮ তারিখে তাকে আবার বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে তার পিয়নের হেফাজতে রাখেন এবং ভাবনার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়ে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেন এবং আসামিকে কারাগারে প্রেরণ করেন। আমরা দেখতে পাই যে মুদ্রিত ফর্মের কলামগুলি আইন অনুসারে পূরণ করা হয়েছে। অভিযুক্তকে ৬ নং কলামের প্রতিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং আসামীর দেয়া উত্তর লেখা হয়েছে। স্বীকারোক্তির নীচে ম্যাজিস্ট্রেট তার নিজের লেখার মাধ্যমে এর সত্যতা এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিন কিনা তা নিশ্চিত করেছেন- "আসামীর শরীরে কোন মারপিটের চিহ্ন নাই। আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তি দিয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়''। স্বীকারোক্তি গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য স্বীকারোক্তির (প্রদর্শনী-৮) সত্যতা সমর্থন করে। তাকে আসামীপক্ষ জেরা করলেও কিছুই বিপরীত পাওয়া যায়নি । দণ্ডিত-কয়েদির স্বীকারোক্তি আমাদের নিকট সত্য এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

৩১. পরীক্ষা করা যাক যে স্বীকারোক্তিতে প্রকাশিত অপরাধ আইনের ধারা ১১(ক) বা দেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইনের অন্য কোন ধারার অধীনে আসে কিনা। আসামীর ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি দুটি ভিন্ন ধরনের অপরাধ করেছেন। প্রথমত, তিনি ভিকটিমের মৃত্যু ঘটান এবং দ্বিতীয়ত, তিনি অপরাধ আড়াল করতে আগুন লাগিয়ে মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেন। স্বীকারোক্তিতে বলা হয়েছে যে দণ্ডিত-বন্দী তার বাড়ি থেকে অনেক দূরে কাজ করতেন। উনিশ দিন পর ঘটনার দিন বিকেলে বাড়ি ফেরেন। সে তার মা এবং ভিকটিমের ইচ্ছামতো কেনাকাটা করেছিল এবং তারপর প্রয়োজনীয় টেলিফোন করার জন্য বাড়ির বাইরে গিয়েছিল। রাত সাড়ে ৮টার দিকে তিনি বাসায় ফিরে দেখেন ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি ভিকটিমকে তাকে খাবার দিতে বলেছিলেন কিন্তু ভিকটিম তাকে তার নিজের ভাত নিজেকেই রান্না করতে বলেছিল। তারপর আসামী ভিকটিমের ঘাড় ধরে টেনে খাট থেকে নামিয়ে তার জন্য ভাত রান্না করতে বলল। এই পর্যায়ে ভিকটিম আসামীর লিঙ্গকে অন্ডকোষের সাথে চেপে ধরে এবং এটি কে ওপরে চাপ দেয়। আসামী তাকে এটি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল কারণ এটা তার মান সম্মানের সাথে সম্পর্কিত ছিল, কিন্তু ভিকটিম তা করেনি। তারপর আসামী দুই হাত দিয়ে ভিকটিমের গলা চেপে ধরে। এরপরও ভিকটিম অভিযুক্তের যৌনাঙ্গ থেকে হাত সরায়নি। এরপর আসামী আরও শক্তি প্রয়োগ করে ভিকটিমের গলা টিপে দেয়। কিছুক্ষণ পর ভিকটিমের হাত ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে পড়ে এবং আসামির লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেড়ে দেয়, ফলস্বরূপ আসামী ভিকটিমের গলা ছেড়ে দেয়। তিনি ভিকটিমকে নাম ধরে ডাকলেও সে কোনো সাড়া দেয়নি। পরে, সে নিশ্চিত হয় যে ভিকটিম মারা গেছে। এরপর রাত ১২টার দিকে তার বাড়ির পাশের একটি খেজুর গাছের নিচে লাশ নিয়ে যায় আসামি। সে বাড়ি থেকে কেরোসিন তেল এনে ভিকটিমের শরীরে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ভোরবেলা সে পালিয়ে যায়।

৩২.	স্বীকারোক্তি পাঠ করে আমরা দেখতে পাই যে, কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো আপীলকারী সেখানে তা ব্যাখ্যা করেছে। আসামী কি ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল স্বীকারোক্তিটি তা প্রকাশ করে। এটি ভিকটিমের উপর কৃত আঘাতগুলোকে সমর্থন করে। স্বীকারোক্তিতে, দন্ডিত-কয়েদি তার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ স্বীকার করেছে। স্বীকারোক্তির বর্ণনা এবং এতে বর্ণিত পরিস্থিতি এ কথা প্রকাশ করে না যে দন্ডিত-বন্দী স্বীকারোক্তিটি ধূর্তভাবে করেছে বা সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আত্মরক্ষার গল্প ফেঁদেছে। এতে বলা হয়েছে যে দন্ডিত-বন্দী এবং ভিকটিম রাতে কোন খাবার খাননি যা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দ্বারা সমর্থিত যেখানে ডাক্তার ভিকটিমের পাকস্থলী খালি পেয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল যখন ভিকটিম অভিযুক্তের যৌনাঙ্গে দলিত/চাপ প্রয়োগ করেছিল যা অভিযুক্তকে একটি অসহনীয় পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়। দন্ডিত বন্দী কোন সত্যকে চাপা না দিয়ে সবকিছু প্রকাশ করে সরল ও অকপট স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যা থেকে স্পষ্ট হয় যে সে ভিকটিমকে তার যৌনাঙ্গ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছিল কিন্তু ভিকটিম তা করেনি। তারপরে সে সেখানে উপরোল্লেখিত প্রক্রিয়ায় ভিকটিমের মৃত্যু ঘটায়।

৩৩.	আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান এই যে, একজন অভিযুক্তের বিচারিক স্বীকারোক্তিকে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং যদি পর্যাপ্ত কারণ থাকে তবে এর কোনো অংশ পরস্পরবিরোধী কিনা তা বিচার করতে হবে। রাষ্ট্র বনাম লালু মিয়া , ৩৯ ডিএলআর (এডি) ১১৭ মামলায় আপিল বিভাগ উপরোক্ত মতামত গ্রহণ করেছেন। দোষ-স্বীকারোক্তির যে অংশ আসামীর আত্মপক্ষকে সমর্থন করে এমন আইনানুগ সাক্ষ্য প্রমাণের অনুপস্থিতিতে উপরে উদ্ধৃত মামলার যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মূলমন্ত্র থেকে সরে যাওয়ার মত কোন কারণ বিদ্যমান নেই।। অসম্ভাব্যতার ভিত্তিতে স্বীকারোক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অংশটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণও আমরা খুঁজে পাইনি। সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ার পরে আমাদের এটাই বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত করে যে বিবৃতিটি সত্য এবং এটি ঘটনার পিছনের কারণসমূহও প্রকাশ করে এবং এটা সার্বিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য।

৩৪.যৌনাঙ্গ (লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ) একজন পুরুষের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গ এবং সেখানে কোনো সহিংসতা ঘটলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়ে। এখানে ভিকটিম তার শক্তি প্রয়োগ করে দন্ডিত বন্দীর যৌনাঙ্গে চাপ প্রয়োগ করে সহিংসতা ঘটায়। অভিযুক্ত বারবার তাকে অঙ্গটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল কিন্তু সে তাতে কোনো কর্ণপাত করেনি। এই পরিস্থিতিতে, এই ধরনের সহিংসতা যুক্তিসঙ্গতভাবে দন্ডিত ব্যক্তির মনে তার জীবনের জন্য বিপদের যথেষ্ট আশংকা সৃষ্টি করে।

৩৫.	আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানোর বিধানটি দণ্ডবিধির ১০০ ধারার অধীনে শুধুমাত্র ধারা ৯৯-এ আরোপিত বিধিনিষেধে সাপেক্ষে ন্যায়সঙ্গত। ধারাটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:

> "১০০। দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, শেষ পূর্ববর্তী ধারায় উল্লিখিত বিধিনিষেধের অধীনে, স্বেচ্ছায় মৃত্যু বা আত্মীয়র অন্য কোনো ক্ষতির জন্য প্রসারিত হয়, যদি সেই অপরাধ যা অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হয় বর্ণনাগুলো পরবর্তীতে গণনাকরা হয়েছে, যথা:-
>
> *প্রথম* - এই ধরনের আক্রমণ যা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশঙ্কা সৃষ্টি করতে পারে যে মৃত্যু অনিবার্য এই ধরনের আক্রমণের পরিণতি হবে;
> *দ্বিতীয়ত* - এই ধরনের আক্রমণ যুক্তিসঙ্গতভাবে আশঙ্কার কারণ হতে পারে যে গুরুতর আঘাত অনিবার্য এই ধরনের আক্রমণের পরিণতি হবে;

তৃতীয়ত ---------
চতুর্থত -------
পঞ্চমত -----------
ষষ্ঠত ---------"

৩৬. উদ্ধৃত আইন অনুসারে, যখন কোন ব্যক্তির উপর প্রথমে জঘন্য আক্রমণ করা হয় তখন তিনি পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য নয়, তবে তিনি বিপদ থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীকে অনুসরণ করতে পারেন। অপরাধীর আক্রমণ থেকে নিজেকে যথাযথভাবে রক্ষা করার পরে এবং যখন বিপদের আশংকা থাকেনা তখন যদি আক্রমনকারীকে হত্যা করা হয়, তখন এই ধরনের হত্যা নরহত্যা। আত্মরক্ষায় নরহত্যা শুধুমাত্র প্রয়োজনের আবেদনের ভিত্তিতেই ন্যায়সঙ্গত এবং এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র জোরপূর্বক ও নৃশংস অপরাধ প্রতিরোধে এসেছে। যে ব্যক্তি আশংকা করে যে তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ বা তার শরীর গুরুতর আঘাতের ঝুঁকিতে রয়েছে, সে তার আক্রমণকারীকে হত্যা করে এটি রক্ষা করার অধিকারী। আত্মরক্ষার অধিকারকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য, আশংকা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হতে হবে এবং আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু আত্মরক্ষা করা প্রয়োজন সেই সীমা তিনি অতিক্রম করবেন না। ধারার দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রে এটা শর্ত নয় যে আক্রমণকারী দ্বারা গুরুতর আঘাত করা আবশ্যক। এমনকি অভিযুক্তকে গুরুতর আঘাত করার মতো কোন কারণ পর্যন্তও অপেক্ষা করতে হবে না; আক্রমণের পরিণতি গুরুতর আঘাত হতে পারে এমন আশঙ্কাই অধিকার প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার এমন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে যিনি হঠাৎ করে তার জীবন বা সম্পত্তির আসন্ন বিপদ এড়াতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের মুখোমুখি হন যা বাস্তব বা আপাত হতে পারে কিন্তু তার নিজ কর্তৃক সৃষ্ট নয়। একজন ব্যক্তির আত্মরক্ষা করার অধিকার রয়েছে যখন সে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা এই ধরনের আঘাতের আশঙ্কা থাকে। আক্রমণের আশংকা যতক্ষণ চলতে থাকে ততক্ষণ এই অধিকারও বলবত থাকে। [হাসান রনি বনাম রাষ্ট্র, ৫৬ ডিএলআর ৫৮০=২৪ বিএলডি (এইচসিডি) ৫৮৩।

৩৭. এই বিশেষ ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাই যে ভিকটিম দোষী ব্যক্তির যৌনাঙ্গ শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিল এবং বল প্রয়োগ করে দলিত করেছিল। আপীলকারী তাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছিল কিন্তু সে তা ছেড়ে দেয়নি, অতঃপর তিনি আক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে এবং তার অন্ডকোষ ছাড়ানোর জন্য ভিকটিমের গলা টিপে ধরে। তার অপরাধ করার কোনো অভিপ্রায় বা পূর্ব পরিকল্পনা ছিলো না। আক্রমনাত্মক স্ত্রীর (ভিকটিম) আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করার সময় এটি একটি দুর্ঘটনা ছিল।

করিম বনাম রাষ্ট্র ১২ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ৯২ মামলার সিদ্ধান্ত অনুসারে-

"আত্মরক্ষা সংক্রান্ত আইন অভিযুক্তকে তার নিজের বিপদের বিচারক করে তোলে এবং তাকে আক্রমণ প্রতিহত করার অনুমতি দেয়, এমনকি প্রয়োজনে প্রাণও কেড়ে নিতে পারে। আদালত তাকে যে পরিস্থিতিতে সে এই অধিকার প্রয়োগ করেছিলো সেই অবস্থানে রেখেই তার বিচার করতে হবে।'

৩৮. প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ক্ষতি করা হয়েছে কিনা বা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা সেই প্রশ্ন বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা একেবারেই অনুপযুক্ত হবে। এ কারণেই কিছু বিচারিক

সিদ্ধান্তে দেখা গেছে যে, হুমকিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে উপায় অবলম্বন করে বা যে শক্তি প্রয়োগ করে তা স্বর্ণ পরিমাপের নিক্তিতে ওজন করা উচিত নয়।

৩৯. এটা ঠিক যে যখন একজন অভিযুক্ত সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মরক্ষার অধিকার দাবী করেন , তখন তার দায়িত্ব হল এমন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা যে তার মামলা যে ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে সে বিষয়ে কার্যকর অনুমান সৃষ্টি করে এবং তা আদালতকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হয়। ফৌজদারি আইনে, ফৌজদারি অপরাধ হতে পারে এমন সমস্ত উপাদান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সর্বদা প্রসিকিউশনের উপর বর্তায় এবং এই প্রমাণের দায় কখনই অভিযুক্তের উপর বর্তায় না। [মুসলিমউদ্দিন এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র ৩৮ ডিএলআর (এডি) ৩১১=৭ বিএলডি (এডি) ১। আত্মরক্ষার অধিকার প্রমাণের দায় অভিযুক্তের উপর বর্তায় তবে এই প্রমাণের দায় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে এমনটা নয়। অভিযুক্তকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এমন অপরাধের প্রতিটি উপাদান প্রতিষ্ঠা করার দায় প্রসিকিউশনের উপর বর্তায়। (৫৬ ডিএলআর ৫৮০=২৪ বিএলডি ৫৮৩)।

রুকুল মিয়া বনা রাষ্ট্র ৮এমএলআর (এইচসিডি) ১১৪=৭ বিএলসি ৩৬৭ মামলা অনুসারে-

> যখন একটি মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতি ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের একটি ক্ষেত্র তৈরি করে, তখন যদিও এটি সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করা হয়নি বা অসম্পূর্নরুপে দাবি করা হয়, অভিযুক্তপক্ষে এই দাবি করার অধিকার থেকে যায়।

৪০.এই ধরনের ফৌজদারি মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকায় আসামীর কৌশলী বিক্ষিপ্তভাবে প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের সাজেশন দিয়েছেন যে ভিকটিম পেটে ব্যথার জন্য আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিটি আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সত্যিকার ও আসল বিষয়টি উন্মোচিত করায় সেটি সামগ্রিক বিবেচনায় আমরা গ্রহণ করেছি।

৪১. আসামী কর্তৃক স্ত্রীর (ভিকটিম) ঘাড় ধরে খাট থেকে নামিয়ে তাকে ভাত রান্না করতে বলার বিষয়টি আমাদের দেশের স্বামীর একটি সাধারন চরিত্র এবং আসামীও এর বাইরে নয়। ভিকটিমের উপর আসামীর উপরোক্ত আক্রমণটি এতটা মারাত্মক ছিল না যার জন্য সে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারত। এই বিষয়ে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল যে যুক্তি দিয়েছেন তার কোনো ভিত্তি নেই।

৪২.এই মামলায় এজাহার দায়ের, পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করা, চার্জশিট জমা দেওয়া এবং চার্জ গঠন করে আইনের ১১ (ক) ধারার অধীনে বিচার করা হয়েছে। বিচার শেষে ট্রাইব্যুনাল আইনের উপরোক্ত ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। ট্রাইব্যুনাল নথিতে থাকা সাক্ষ্য প্রমাণ ও অন্যান্য বিষয় মূল্যায়ন না করেই তথ্যগত ও আইনগত ভুল ধারণার ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন যে দন্ডিত কয়েদী পূর্বপরিকল্পিতভাবে যৌতুকের জন্য খুনের অপরাধ করেছে। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণে ট্রাইব্যুনালের এই ধরনের অনুসন্ধান নথিভুক্ত উপাদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং আইনের দৃষ্টিতেও যুক্তিযুক্ত নয় । প্রসিকিউশন আইনের ধারা ১১(ক) এর অধীনে বা দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু ট্রাইব্যুনাল আইনের ১১(ক) ধারায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং তার অধীনে তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। মামলার ঘটনাগত

বিষয়সমূহ , স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্য রেকর্ডে থাকা বিষয়সমূহ বিবেচনায় অপরাধীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২০১ ধারার অধীনে অপরাধটি ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

৪৩. অসীমন বেগমের মামলায় [৫১ ডিএলআর (এডি) ১৮], অভিযুক্তকে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ এর প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয়েছিল কিন্তু দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার প্রথম অংশের অধীনে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট বিভাগ ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল করে বিজ্ঞ দায়রা জজের নিকট বিচারের জন্য মামলাটি রিমান্ডে পাঠান। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলকারী আপিল বিভাগে যান এবং সর্বোচ্চ আদালত মেরিটের ভিত্তিতে হাইকোর্টমামলা নিষ্পত্তি করতে রিমান্ডে পাঠান। এই মামলায় আমরা দেখতে পাই যে, দণ্ডিত-কয়েদি আগে যে ঘটনা ঘটিয়েছেন সেটি গোপন করার জন্য ভিকটিমের লাশে আগুন দিয়ে তিনি দণ্ডবিধির ২০১ ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন । ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে গঠিত সাধারন ফৌজদারী আদালতেই এ ধরনের অপরাধের বিচার করা যেতে পারে। স্বীকারোক্তিতে তার লাশে আগুন দেয়ার বিষয়ে দেয়া বক্তব্য মেডিকেল সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২০১ ধারায় কোনো অভিযোগ গঠন করা হয়নি। ট্রাইব্যুনাল ১১(ক) ধারার পাশাপাশি ২০০০ সালের আইনের ২৭(৩) ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে দন্ডবিধির উপরোক্ত ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করতে পারতো। আমাদের পর্যবেক্ষণে আমরা দেখেছি যে যদি অভিযুক্তর বিরূদ্ধে আইনের ১১(ক) বা যেকোন ধারার পাশাপাশি দন্ডবিধির ২০১ ধারায় চার্জ গঠন করা হতো তাহলে তবে এই ধারার অধীনে তাকে দোষী সাব্যস্ত্য করা যেতো এবং তাকে এই ধারার অধীনে দায়রা জজ কতৃক সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছরের কারাদন্ড প্রদান করা যেতো। কিন্তু এই মামলায় দণ্ডিত-বন্দী ১২ (বার) বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন, যার মধ্যে তিনি ৫ (পাঁচ) বছরেরও বেশি সময় ধরে কনডেম সেলে রয়েছেন। যদি আমরা মামলাটি দণ্ডবিধির ২০১ ধারার অধীনে অপরাধের বিচার করার এখতিয়ারসম্পন্ন উপযুক্ত আদালতে পাঠাই তাহলে , রাষ্ট্র বনাম নুরুল আমিন ভূইয়া (পলাতক) ২০১৯ (১) ১৫ এএলআর (এডি) ১৫১ মামলার সিদ্ধান্ত অনুসারে এটি হবে ক্ষমতার অনর্থক প্রয়োগ এবং আসামিকে অযথা হয়রানি করা। দণ্ডিত-বন্দী এর দ্বারা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অধিকন্ত, উদ্ধৃত মামলার (*ibid*) সাথে এই মামলার কোন মিল নেই। তাই এই পর্যায়ে এসে আমরা মামলাটিকে নতুন করে বিচারের জন্য রিমান্ডে পাঠাতে আগ্রহী নই, যদিও তা করতে কোনো বাধা নেই।

৪৪. আমরা দেখতে পাই যে ভিকটিমের মৃত্যু সম্পর্কে আসামীপক্ষের বক্তব্য বা স্বীকারোক্তিতে আসামির বক্তব্য প্রসিকিউশনের ব্যাখ্যার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। দণ্ডিত-বন্দী তার আত্মরক্ষার দাবী প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং সে তার অধিকারের সীমা অতিক্রম করেনি, যার জন্য সে দণ্ডবিধির ১০০ ধারার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। আলোচিত অপরাধ কোনোভাবেই দণ্ডবিধির ধারা ৩০০ এর অধীনে সংজ্ঞায়িত 'খুন' এর সংজ্ঞার মধ্যে আসে না এবং সেইজন্য একই কোডের ৩০২ ধারা বা আইনের ১১(ক) এর অধীনে আসামীকে শাস্তি দেওয়া যায় না। ট্রাইব্যুনাল মামলার এই বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে এবং আইনের ১১(ক) ধারার অধীনে গঠিত অভিযোগে আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সংক্ষুব্ধ রায় আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই রায় বাতিল হওয়া উচিত। তদনুসারে, আমরা আপিলের মেরিট পেয়েছি।

৪৫. ফলস্বরূপ , রেফারেন্সটি প্রত্যাখ্যান করা হলো এবং ফৌজদারি আপিল মঞ্জুর হলো। ২০০০ সালের আইনের ১১(ক) ধারার অধীনে আপীলকারী নির্দোষ। ট্রাইবুনাল কর্তৃক ঘোষিত রায় এবং দন্ডাদেশ বাতিল করা হলো।

৪৬.	অন্য কোন মামলায় দন্ডিত দন্ড না হলে অবিলম্বে বন্দী মোঃ আব্দুস সালাম, পিতাঃ মোঃ শুকুর আলী ওরফে শুক্রা গ্রাম-শ্রীরামপুর গয়হাট্টা, থানা-উল্লাপাড়া, জেলা-সিরাজগঞ্জে- কে মুক্তি দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো । সেই অনুযায়ী জেল আপীলও নিষ্পত্তি হলো।

৪৭. রায় সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হোক এবং নথি নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হোক।

দায়বর্জন বিবৃতি(DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজেস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।